আইনের কথা

অভিভাবকত্ব

অভিভাবকত্ব বলতে বোঝায় নিজের দেখাশোনা বা পরিচালনা করতে অক্ষম এমন কোনো ব্যক্তিকে বা তার সম্পত্তির বা ওই ব্যক্তি এবং তার সম্পত্তি উভয়ের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা বা অধিকার। যেমন– নাবালক, উন্মাদ ও অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা নিজেদের দেখাশোনা করতে অক্ষম। উল্লেখ্য, নাবালক বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাবে যার বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হয় নাই। নির্বোধ, উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ বলতে যে কোনো বয়সের ব্যক্তিকেই বুঝাবে। বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই নাবালক সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হয়ে থাকে। যা হোক, মুসলিম আইনে বাবাই সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক।

আমরা এখন মুসলিম আইন অনুযায়ী অভিভাবকত্ব নিয়ে আলোচনা করবো। মুসলিম আইন অনুযায়ী অভিভাবকত্ব তিন প্রকার:

১. সন্তানের অভিভাবকত্ব
২. সন্তানের সম্পত্তির অভিভাবকত্ব
৩. সন্তানের বিয়ের অভিভাবকত্ব

কারা সন্তানের অভিভাবক হতে পারেন?

মুসলিম আইনে বাবা হলেন সন্তানের স্বাভাবিক আইনগত অভিভাবক। মুসলিম আইনে মা সন্তানের অভিভাবক হতে পারেন না। তবে মা সাত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে সন্তানকে ও বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত মেয়ে সন্তানকে কাছে রাখতে পারেন। এই অধিকারকে বলে 'হিজানা' বা জিম্মাদারিত্ব। কিন্তু মা কখনোই সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক হতে পারেন না।

মুসলিম আইনে বাবা হলেন সন্তানের স্বাভাবিক আইনগত অভিভাবক

উদাহরণ: *সালাউদ্দিন ও লায়লার বিয়ে হয়েছে চার বছর। তাদের একটি তিন বছরের ছেলে ও একটি দুই বছরের মেয়ে আছে। সালাউদ্দিন লায়লাকে তালাক দেয় ও ছেলে-মেয়ে দু'জনকেই নিজের কাছে রেখে দেয়। এরকম ক্ষেত্রে আদালতের মাধ্যমে লায়লা তার ছেলেকে সাত বছর ও মেয়েকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতে পারবে।*

এখানে একটি ব্যাপার উল্লেখ্য যে, সন্তানরা অন্যান্য নারী আত্মীয়দের যত্নে বড় হয়ে উঠলেও, সন্তানের ওপর বাবার সার্বিক তত্ত্বাবধান থেকেই যায়। মা তালাক হওয়ার কারণে সন্তানের জিম্মাদারিত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন না। কিন্তু মা দ্বিতীয় বিবাহ করলে সন্তানের জিম্মাদারিত্বের অগ্রাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। তবে সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ওই সন্তানের ওপর মায়ের অভিভাবকত্ব যথার্থ বিবেচিত হয় তাহলে আদালত মাকে ওই সন্তানের অভিভাবক নিয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ করলেই মা সন্তানের উপর জিম্মাদারিত্ব হারান না।

তবে, স্বামী-স্ত্রী যখন একত্রে বসবাস করেন, তখন সন্তান তাদের কাছেই থাকবে। একত্রে বসবাসের সময় স্বামী যেমন কোনক্রমেই স্ত্রীর কাছ থেকে সন্তানকে সরিয়ে নিতে পারেন না, তেমন স্ত্রীও নাবালক সন্তানের জিম্মাদারিত্বের অধিকার সত্ত্বেও, স্বামীর অনুমতি ছাড়া সন্তানকে সরিয়ে নিতে পারেন না।

মা ছাড়া অন্য কারা নাবালকের জিম্মাদারিত্বের অধিকার লাভ করতে পারেন?

যখন কোনো নাবালকের মা মারা যায় বা কোনো কারণে নাবালকের জিম্মাদারিত্বের অধিকার হারিয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে নিচের মহিলা আত্মীয়রা জিম্মাদারের দায়িত্ব পাবেন–

১. মা-এর মা, যত উপরের দিকে হোক (যেমন–নানী, নানীর মা প্রমুখ)
২. বাবার মা, যত উপরের দিকে হোক (যেমন–দাদী, দাদীর মা প্রমুখ)
৩. পূর্ণ বোন (বাবা-মা একই)
৪. বৈপিত্রেয় বোন
৫. পূর্ণ বোনের কন্যা, যত নিচের দিকে হোক
৬. বৈপিত্রেয় বোনের কন্যা, যত নিচের দিকে হোক
৭. পূর্ণ খালা, যত উপরের দিকে হোক
৮. বৈপিত্রেয় খালা, যত উপরের দিকে হোক
৯. পূর্ণ ফুপু (বাবার আপন বোন)।

মা ও মাতৃস্থানীয় আত্মীয়রা ছাড়া আর কারা নাবালকের জিম্মাদারিত্বের অধিকার লাভ করতে পারেন?

উপরে উল্লেখিত মহিলারা না থাকলে নাবালকের যারা অভিভাবক হতে পারেন, তারা জিম্মাদারিত্বের অধিকার পাবেন। অর্থাৎ

১. বাবা
২. নিকটতম দাদা

সাত বছর বয়স পর্যন্ত মা ছেলে সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে পারেন

৩. পূর্ণ ভাই (যাদের বাবা-মা এক)
৪. পূর্ণ ভাইয়ের ছেলে
৫. রক্ত সম্পর্কীয় ভাইয়ের ছেলে
৬. উত্তরাধিকারে বাবার বংশের সমান শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য আত্মীয়রা– যেমন চাচা।

সন্তানের অভিভাবক কে হবেন ?

মুসলিম আইন অনুযায়ী মা যদিও স্বাভাবিক অভিভাবক নন, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অভিভাবকত্বের আবেদন করতে পারেন, যেমন– মা যদি দেখেন সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক যিনি, তিনি সন্তানকে ঠিকমত দেখাশোনা করছেন না বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন তবে মা নিজ সন্তানের প্রকৃত কল্যাণের জন্য তার কাছে সন্তান থাকা উচিত মর্মে অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করতে পারেন। ছেলে সন্তানের সাত বছর পূর্ণ হলে এবং কন্যা সন্তান বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা অভিভাবকত্বের অধিকার পেতে পারেন–

১. বাবা
২. বাবা কর্তৃক সম্পাদিত উইলে সন্তানের অভিভাবকত্ব যে ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে
৩. বাবার বাবা, যত উপরেই হোক
৪. আপন ভাই
৫. রক্ত সম্পর্কীয় ভাই
৬. আপন ভাইয়ের ছেলে
৭. রক্ত সম্পর্কীয় ভাইয়ের ছেলে
৮. বাবার আপন ভাইয়ের ছেলে
৯. বাবার রক্ত সম্পর্কীয় ভাইয়ের ছেলে।

যেক্ষেত্রে এরকম কোনো আত্মীয়ও নেই, সেক্ষেত্রে আদালত তার স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতাবলে যে কাউকে নাবালক, নির্বোধ, উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অভিভাবক নিয়োগ করতে পারে।

আদালত কেন অভিভাবক নিয়োগ করবে?

যদি কোনো নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবক থেকে থাকে, তবে আদালতের মাধ্যমে অভিভাবক নিয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে স্বাভাবিক অভিভাবক তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বা স্বাভাবিক অভিভাবকের মৃত্যু হলে অভিভাবকত্বের অধিকার নিয়ে মা-বাবা বা দাদা বা নানী-বাবার মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে ও সন্তানের অভিভাবকত্ব দাবি করে একাধিক আবেদনপত্র জমা হলে আদালত সমগ্র পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ শেষে নাবালকের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত ব্যক্তিকে অভিভাবক নিয়োগ করবে।

উদাহরণ: *রিফাতের বাবা একজন সুস্থ, উপার্জনক্ষম ও স্নেহশীল পিতা ছিলেন। কিন্তু প্রায় এক বছর ধরে তিনি উন্মাদ। রিফাতের মাও চাকুরিজীবী, ভাল উপার্জন করেন। রিফাতের দাদা যদিও উপার্জনে অক্ষম, শুধু জেদের কারণে তিনি আদালতে রিফাতের অভিভাবকত্ব চেয়ে আবেদন করেছেন। রিফাতের দশ বছর বয়স হয়েছে। আদালত সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে রিফাতের মাকে অভিভাবক নিয়োগ করতে পারে।*

সন্তানের সম্পত্তির অভিভাবক কারা হতে পারেন?

সন্তানের সম্পত্তির অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম আইন তিন ধরনের অভিভাবকত্ব স্বীকার করে–

১. আইনগত অভিভাবক
২. আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক ও
৩. কার্যত অভিভাবক।

১. আইনগত অভিভাবক: নাবালকের সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা আইনগত অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃত–

ক. বাবা
খ. বাবা কর্তৃক ইচ্ছাপত্র (উইল) দ্বারা নিয়োগকৃত নির্বাহক

গ. দাদা

ঘ. দাদা কর্তৃক ইচ্ছাপত্র (উইল) দ্বারা নিয়োগকৃত নির্বাহক।

নাবালকের সম্পত্তি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে আইনগত অভিভাবকের ক্ষমতা কতটুকু?

একজন আইনগত অভিভাবক নাবালকের খাদ্য, বস্ত্র বা লালন-পালনের মতো অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে নাবালকের জিনিসপত্র ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারেন। এছাড়াও একজন আইনগত অভিভাবক শুধুমাত্র নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে নাবালকের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারেন যখন–

১. ক্রেতা দ্বিগুণ মূল্য দিতে প্রস্তুত;
২. সম্পত্তিটি ধ্বংসের পথে;
৩. যদি সম্পত্তির ব্যয় তার আয়কে ছাড়িয়ে যায়। তবে এ জাতীয় বিক্রয় কেবলমাত্র নাবালকের ভরণপোষণ বা উইলের দাবি পরিশোধ, ঋণ বা ভূমি কর পরিশোধের জন্যই করা যেতে পারে;
৪. সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে।

২. আদালত কর্তৃক নিয়োগকৃত অভিভাবক:

উপরোক্ত আইনগত অভিভাবকদের অনুপস্থিতিতে সন্তানের সম্পত্তির অভিভাবকদের জন্য আদালত

যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে নাবালকের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করেন, তবে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক আদালতের অনুমতি ছাড়া নাবালকের স্থাবর সম্পত্তির কোনো অংশ বন্ধক দিতে বা বিক্রয়, দান, বিনিময় বা অন্য কোনো প্রকারে হস্তান্তর করতে পারেন না।

৩. কার্যত অভিভাবক: কোনো ব্যক্তি আইনগত অভিভাবক কিংবা আদালত কর্তৃক নিয়োগকৃত অভিভাবক না হলেও স্বেচ্ছায় নাবালকের শরীর ও সম্পত্তির দায়িত্ব নিতে পারেন। এ ধরনের অভিভাবকত্বকে কার্যত অভিভাবক বলা হয়। একজন কার্যত অভিভাবক নাবালকের ব্যক্তির (শরীর) ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। একজন কার্যত অভিভাবক নাবালকের স্থাবর সম্পত্তির কোনো স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার হস্তান্তর করতে পারেন না এবং তিনি তা করলে সে হস্তান্তর বাতিল হবে। মা, চাচা, ভাই, শ্বশুর প্রমুখ হলেন কার্যত অভিভাবক। নাবালকের কোনো স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় বা যেকোনো ধরনের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা তার নেই।

সন্তানের বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবক কে কে হতে পারেন?

সন্তানের বিয়ের ক্ষেত্রে বাবার বংশের লোকদের ওপর প্রথমে দায়িত্ব ন্যস্ত হবে। তারা ব্যর্থ হলে মায়ের বংশের আত্মীয়রা নাবালকের বিয়ে চুক্তি সম্পাদনের দায়িত্ব পাবেন। তবে উপমহাদেশে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯' পাস হওয়ার পর থেকে সন্তানের বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব কার্যকরী নয়। কারণ, এ আইনে প্রাপ্তবয়স্ক (ছেলের ক্ষেত্রে ২১ ও মেয়ের ক্ষেত্রে ১৮ বছর) না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন পুত্র-কন্যা বিয়ের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত দানে সক্ষম না হয়, ততদিন অভিভাবকদের বিয়ে দেওয়ারও কোনো এখতিয়ার নেই। উপরন্তু উক্ত আইনের ৫ ধারা অনুসারে বাল্যবিবাহ সম্পাদনকারী অভিভাবক ও সহায়তাকারী সকলেই

১ মাস পর্যন্ত বিনাশ্রমে কারাদণ্ড বা ১ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। মুসলিম আইনে সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উইল করে কোনো অভিভাবক নিয়োগের প্রচলন নেই।

অভিভাবক হবার যোগ্যতা কী?

মুসলিম আইনে সন্তানের অভিভাবক নিযুক্তির জন্য কোনো আনুষ্ঠানিকতার দরকার নেই। মনোনীত ব্যক্তি ১৮ বছর বয়স্ক ও সুস্থ-মস্তিষ্ক হলেই অভিভাবক হবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হন।

আদালত কিভাবে অভিভাবক নিয়োগ করে?

গার্ডিয়ানস এণ্ড ওয়ার্ডস্ এ্যাক্ট, ১৮৯০-এর ধারা ১৭(ক)-এর অধীনে নাবালকের অভিভাবক হিসেবে নিযুক্তির জন্য শুধু নিকটাত্মীয় বা প্রিয়জনই নয়, নাবালকের যেকোনো আত্মীয় বা বন্ধুও পারিবারিক আদালতের কাছে আবেদন করতে পারেন। আদালত এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অভিভাবকত্ব নির্ধারণ করতে পারে–

ক. নাবালকের কল্যাণ

খ. নাবালকের বয়স, লিঙ্গ ও ধর্ম

গ. আবেদনকারী অভিভাবকের চরিত্র ও আর্থিক সক্ষমতা, নাবালকের সাথে তার গোত্র-সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা

ঘ. পিতা-মাতা কারও মৃত্যু হয়ে থাকলে মৃতের অন্তিম ইচ্ছা (কার কাছে সন্তান মানুষ হবে সে বিষয়ে)

ঙ. নাবালক বা তার সম্পত্তির সাথে আবেদনকারী অভিভাবকের অতীত বা বর্তমান কোনো সম্পর্ক থেকে থাকলে

চ. নাবালকের নিজস্ব ইচ্ছা, তার অভিভাবক নির্বাচনের মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা থেকে থাকলে।

উদাহরণ: *রঞ্জুর বয়স সাড়ে ছয়। রঞ্জুর বাবা সালাউদ্দিন মদ্যপ ও জুয়ারি। রঞ্জুর মা স্কুল শিক্ষিকা, এছাড়াও তার একটি ছোটখাট পারিবারিক ব্যবসাও আছে। রঞ্জুর বাবা-মা'র মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়ার কারণে উভয়ই আদালতে রঞ্জুর অভিভাবকত্বের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। রঞ্জু একজন মুসলিম পুত্র-সন্তান। মাত্র ছয়মাস পরে তার ওপর তার মা'র জিম্মাদারিত্বের অধিকার শেষ হয়ে যাবে। রঞ্জু যদিও অনেক ছোট তবু আদালতে সে জানিয়েছে যে, সে মা'র কাছে থাকতে চায়। কারণ, তার বাবা প্রায়ই তাকে ও তার মা'কে নিষ্ঠুরভাবে মারধর করতো। উল্লেখ্য, রঞ্জু তার স্কুলে একজন ভাল ছাত্র। রঞ্জু যেহেতু তার মা'র কাছেই থাকতে চায়, সেহেতু আদালত রঞ্জুর ইচ্ছা অনুসারে মা'কেই রঞ্জুর অভিভাবক হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন।*

অভিভাবক নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালত নাবালকের নিজস্ব ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেবে

ভরণপোষণ

ভরণপোষণ কী?

জীবনে বেঁচে থাকতে হলে যা যা প্রয়োজন যেমন, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি যাবতীয় চাহিদার পূরণই হলো ভরণপোষণ। মুসলিম আইন অনুসারে, একজন সক্ষম ও উপার্জনশীল ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও উত্তরসূরী, বাবা-মা ও পূর্বসূরী ও অন্যান্য দরিদ্র আত্মীয়দের ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। বিয়ের ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক যেসব অধিকার ও দায়িত্বের সৃষ্টি হয় সেগুলোর মধ্যে ভরণপোষণ অন্যতম।

স্বামী কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেবেন?

মুসলিম আইনে স্ত্রীর ভরণপোষণ দেয়া স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। সে স্ত্রী মুসলিম বা কিতাবিয়া, ধনী বা গরীব, তরুণী বা বৃদ্ধা– যাই হোক না কেন। বিবাহিত জীবনের সকল সময়েই স্ত্রী, স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবেন। এছাড়াও স্বামী যদি স্ত্রীর মোহরানার তাৎক্ষণিক অংশ পরিশোধ না করে বা স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে, তবে সেক্ষেত্রেও স্ত্রী, স্বামীর কাছ থেকে পৃথকভাবে বসবাস করতে পারেন ও ভরণপোষণ চাইতে পারেন। কিংবা, স্বামী যদি স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করেন বা কোনো রক্ষিতা রাখেন, সেক্ষেত্রে স্ত্রী, স্বামীর সাথে একত্রে বসবাসে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন ও ভরণপোষণ চাইতে পারেন।

উদাহরণ: *নীরার বিয়ের সাত বছর পার হওয়ার পরও নীরার স্বামী মেসবাহ দেনমোহরের তাৎক্ষণিক অংশ পরিশোধ করতে পারেনি। সে প্রায়ই নীরাকে বাপের বাড়ী থেকে টাকা এনে দেবার জন্য প্রচণ্ড মারধোর করে। অত্যাচারের এক পর্যায়ে নীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। নীরা এখন কী করবে?*
নীরা এক্ষেত্রে মেসবাহর কাছ থেকে পৃথক হয়ে বসবাস করতে পারে ও ভরণপোষণ চাইতে পারে। আদালত সেক্ষেত্রে নীরার ভরণপোষণের দাবী মঞ্জুর করতে পারে।

উলে-খ্য, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী আর ভরণপোষণ পাবেন না। কারণ তখন তিনি উত্তরাধিকারী হবেন। তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রী ইদ্দত চলাকালীন সময় পর্যন্ত ভরণপোষণ পাবেন।

ভরণপোষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সামর্থ্য কি বিবেচ্য?

কোনো স্ত্রী ভরণপোষণ পেতে অধিকারী কিনা সেই বিষয়টি সুস্থির করার জন্য স্ত্রীর সামর্থ্য বিবেচনায় আসবে না। স্বামী তাকে যথোপযুক্তভাবে ভরণপোষণ দেন নাই, কেবল এই বিষয়টিই স্ত্রীকে ভরণপোষণের একটি আদেশ পাওয়ার অধিকারী করবে।

সন্তান-সন্ততি বা উত্তরসূরীদের ভরণপোষণ কে বা কারা দেবেন?

মুসলিম আইনে একজন পিতা তার নাবালক পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। শুধুমাত্র যখন পুত্র সন্তান বয়ঃসন্ধিতে পদার্পণ করেন সেই সময় থেকে পিতা পুত্রের ভরণপোষণ দিতে আর বাধ্য নন। কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে এ সময়সীমা যতদিন না তার বিয়ে হচ্ছে, সে সময় পর্যন্ত বহাল থাকে। অর্থাৎ মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বাবা তাকে ভরণপোষণ

কন্যা সন্তানের বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত পিতা ভরণপোষণ দেবে

দিতে বাধ্য। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত মেয়েকেও বাবা ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। তবে বিধবা পুত্রবধূর ভরণপোষণে তিনি বাধ্য নন। যদি কোনো পিতার যুবক সন্তান পঙ্গু বা অসমর্থ হয়ে থাকে, তবে পিতা তাকে ভরণপোষণ প্রদান করবেন। নাবালক পুত্র ও অবিবাহিত কন্যা যৌক্তিক কারণ ছাড়াই পিতার কাছ থেকে পৃথক বসবাস শুরু করলে, পিতা সেক্ষেত্রে তাদের ভরণপোষণে বাধ্য নন। যে শিশু সন্তানের নিজস্ব সম্পত্তি রয়েছে, পিতা তার ভরণপোষণ দিতে বাধ্য নন।

উদাহরণ: *সুমনের নানা মৃত্যুর আগে সুমনের নামে কিছু জমি দান করে দিয়ে যান এবং সুমনের মাকে সুমনের সম্পত্তির জিম্মাদার হিসেবে নিযুক্ত করে যান। এক্ষেত্রে সুমন যদিও মাত্র বার বছরের বালক কিন্তু সে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী। সুমনের পিতা এক্ষেত্রে সুমনকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য নন।*

বাবা দরিদ্র ও শারীরিকভাবে অক্ষম হলে, নাবালক পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব বর্তায় মার ওপর। মা ব্যর্থ হলে দাদা ভরণপোষণ দিবেন। মুসলিম আইনে যদিও ১৫ বছরকে বয়ঃসন্ধিকাল হিসেবে ধরা হয় কিন্তু সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ অনুযায়ী পুত্র-কন্যা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বাবা-মার কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবেন।

পিতা-মাতা বা পূর্বসূরীদের ভরণপোষণ দেবার দায়িত্ব কার?

দরিদ্র বা অভাবী বাবা, মা, দাদা ও দাদীকে ভরণপোষণ যোগানো যেকোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। দরিদ্র বাবা-মাকে ভরণপোষণের দায়িত্ব সন্তানদের ওপর সমভাবে বর্তায়, তা সে সন্তান ধনী বা গরীব, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন।

উদাহরণ: *করিম এক দরিদ্র বৃদ্ধ, যার কোনো সম্পত্তি নাই। করিমের পুত্র খলিলের ১ লক্ষ টাকা মূল্যমানের সম্পত্তি রয়েছে এবং করিমের কন্যা গহরজানের ৫০,০০০ টাকা মূল্যমানের সম্পত্তি রয়েছে। আদালতের কাছে যদি মনে হয় যে, মাসিক ৫০০ টাকায় করিমের ভরণপোষণ সম্ভব, তবে আদালত করিমের ভরণপোষণের জন্য খলিলকে মাসিক ২৫০ টাকা ও গহরজানকেও মাসিক ২৫০ টাকা দিতে নির্দেশ দিতে পারে।*

অন্য কোনো আত্মীয় কি ভরণপোষণ পেতে পারেন?

অন্যান্য দরিদ্র আত্মীয়দের উত্তরাধিকারে তাদের প্রাপ্য অংশের অনুপাত হিসেবে ভরণপোষণ দেয়া যেতে পারে।

স্ত্রী কিভাবে স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ আদায় করতে পারেন?

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসমূহের আওতায় একজন মুসলিম স্ত্রী নিম্নোক্ত পন্থায় স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ আদায় করতে পারেন।

ক. ধারা নং ৪৮৮, ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮-এর অধীনে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে মাসিক ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। এই আইনের বিধানমতে স্ত্রীর ভরণপোষণ আদায়ের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করা যায়।

খ. ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৪(গ) ধারার অধীনে একজন মুসলিম স্ত্রী, তার ভরণপোষণ আদায়ের জন্য সরাসরি পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন।

পারিবারিক আদালতকে এ ব্যাপারে নিরংকুশ ক্ষমতা প্রদান করায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৮ ধারার এখতিয়ার পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ দ্বারা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বাতিল বলা যায়। ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর অবস্থা ও পদমর্যাদা বিবেচনা করে আদালত একটি যথোপযুক্ত পরিমাণ ধার্য করবেন। আদালতের ধার্যকৃত তারিখে যদি স্বামী ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হন, তবে আদালত তাকে ১ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিতে পারেন। কারাদণ্ড ভোগ করলেও ভরণপোষণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে একাধিক কিস্তির আদেশ বরখেলাপের কারণে আদালত একাধিকবার কারাদণ্ড দিতে পারেন।

গ. ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের ২(খ) ধারার অধীনে, কোনো স্বামী দু'বছর পর্যন্ত স্ত্রীকে ভরণপোষণ না দিলে স্ত্রী আদালতে বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন এবং এইভাবে স্বামীকে ভরণপোষণ প্রদানে বাধ্য করতে পারেন।

ঘ. ইদানিং দেশে অসহায়, নির্যাতিত ও দরিদ্র মেয়েদের পক্ষে মামলা দাখিল ও পরিচালনা করাসহ নানা ধরনের আইনগত সাহায্য দিতে বহু সংগঠন এগিয়ে আসছে। এসব সংগঠন বা সংস্থার মধ্যে উলে-খযোগ্য হলো ***আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক),*** বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সংস্থা (বিএনডবি-উএলএ), মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এণ্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট প্রভৃতি। অসহায়, নির্যাতিত মেয়েরা, যারা স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাচ্ছেন না আবার একা একা আদালতে লড়াই চালানোর মত সাহস বা আর্থিক সঙ্গতি যাদের নেই- তারা এসব সংস্থায় যোগাযোগ করলে বিনা খরচে মামলা লড়তে পারবেন ও ভরণপোষণ আদায়ে সক্ষম হবেন।

'নারী-পুরুষ সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায়বিচার' কর্মসূচি

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের বিগত কয়েক বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এ ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে নারীরা শিকার হচ্ছেন নানারকম বৈষম্যের। প্রচলিত আইন অথবা আইনের প্রয়োগ- উভয় ক্ষেত্রেই নারী তুলনামূলকভাবে কম সুবিধা ও অধিকারের দাবিদার। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন প্রচলিত আইনের সংস্কার সাধন এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নারীরা নারী বলে যেন বিশেষ সীমাবদ্ধতা ও অবিচারের ভুক্তভোগী না হন, সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া। আইন সংস্কার একটি অতি জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের কাজটি সম্পাদন করা তত কঠিন নয়। এই উপলব্ধি থেকেই *আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)* এই কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। 'নারী-পুরুষ সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায়বিচার' নামে এই কর্মসূচির মূল বক্তব্য হচ্ছে নারীর প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই কর্মসূচির অন্যতম পর্যায় হচ্ছে পারিবারিক আইন নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করা। ১৯৯৬-এর জুলাই মাস থেকে এই কর্মসূচির কাজ শুরু হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে- বিয়ে, দেনমোহর, তালাক ও ভরণপোষণ ইত্যাদি বিষয়ে নানা স্তরের মানুষের মধ্যে, এমনকি যারা নেতৃস্থানীয় অবস্থানে আছেন, তাদের মধ্যেও নানারকম ভুল ধারণা এবং অসঙ্গতি প্রচলিত রয়েছে।